Vol. 45 | No. 1 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী মোতাহার হোসেনের শিক্ষাচিন্তা

Volume	45
Issue	1
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এম. এম. নজমুল হক
Published online	October 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v45i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i1.3
Pages	৭৫-৯৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কাজী মোতাহার হোসেনের শিক্ষাচিন্তা

এম. এম. নজমুল হক*

কোনো জাতির সভ্যতার উৎকৃষ্ট মাপকাঠি তার শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক, পাঠপ্রণালী ইত্যাদি। এগুলো জাতীয় আদর্শ, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিরও ভিত্তিভূমি। তাছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও শিক্ষানুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তাধারায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। কেননা পেশায় তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী অধ্যাপক। শিক্ষার সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব যে কত গভীর ও ব্যাপক তা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন :

> জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার যতদিন না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত পুস্তকের শিক্ষা ছাড়াও নানা বিষয়ে যে সমস্ত মূলসূত্র সামান্য বুদ্ধিমান লোকে বুঝিতে পারে, সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়াই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ... উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কোন ভূঁইফোড় সমাজই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিতে পারে না।[১]

সমাজের 'সর্বাঙ্গীণ উন্নতি' বলতে তিনি আর্থিক ও আত্মিক উভয়বিধ উন্নতিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন মানবসম্পদ উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে। তাই বাঙালি মুসলমানের শিক্ষিত অংশের কেবল চাকরিমুখী মানসিকতাকে তিনি সমালোচনা করেছেন। এই ক্ষতিকর মানসিকতা ত্যাগ না করলে শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলার কারণে তারা যে হিন্দু সমাজের তুলনায় ৫০/৬০ বছর পিছিয়ে পড়েছে তার চেয়ে আরো পিছিয়ে পড়তে পারে বলে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন।[২]

---

* প্রাবন্ধিক, গবেষক।

কাজী মোতাহার হোসেনের শিক্ষাচিন্তা ছিল মূলত মুসলিম সমাজকেন্দ্রিক। তিনি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তাও করেছেন। কিন্তু বিশ শতকের যে সময়ে তিনি লিখতে আরম্ভ করেছেন, ততদিনে প্রতিবেশি হিন্দুসমাজ শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। তাই যুগের প্রয়োজন ও বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি মুসলমান সমাজের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন বেশি। তাছাড়া দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষা সমস্যাও এক রকম ছিল না। জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় মুসলমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার পাশাপাশি যে শিক্ষাটুকু গ্রহণ করছিল তাও ছিল জীবন ও যুগের সাথে সঙ্গতিহীন, অবাস্তব, পরস্পরবিরোধী এবং ধর্মান্ধতার মায়াজালে আচ্ছন্ন। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর শিক্ষাচিন্তার বাতি জ্বেলে এই তমসাচ্ছন্ন ও অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে মুক্তির দিশা দিতে চেয়েছিলেন।

২

ইংরেজ শাসনামলে ভারতে মুসলমানদের জন্য দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একটি মক্তব-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক প্রাচীন পদ্ধতির ধর্মীয় শিক্ষা, অন্যটি স্কুল-কলেজকেন্দ্রিক সাধারণ শিক্ষা। পুরোনো পদ্ধতির মাদ্রাসায় কেবল ধর্মশাস্ত্র, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ফিকহ্ ইত্যাদি পড়ানো হতো। অধিকাংশ মুসলমান শিক্ষার্থী কেবল 'দ্বীন-ই-ইলম হাসিল' করে বাহাস-বিতর্ক ও ফতওয়া জারির মাধ্যমে নিছক পারলৌকিক সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় যেত মাদ্রাসায়। কিন্তু কালের পরিবর্তনে এই অকেজো বিদ্যায় মুসলমানের আর চলছিল না, তাই সে অনুভব করেছিল আধুনিক শিক্ষার আবশ্যকতা। অথচ ধর্মশিক্ষার প্রতি অনুরাগের কারণে পুরাতনকে অস্বীকার করার মতো পুরোপুরি শক্তি তার ছিল না। এই টানাপড়েনের ফলে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার যৌথ পাঠক্রম তৈরির মাধ্যমে উদ্ভব ঘটে এক নব পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষার।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ মাদ্রাসা শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয়, গতানুতিক ও অবৈজ্ঞানিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী আবুল হুসেন নিউস্কীম মাদ্রাসার সমালোচনায় লিখেছেন :

> নব মাদ্রাসা-শিক্ষা পদ্ধতিও জীবনের সঙ্গে যোগ সাধন করতে পারে নাই। এরূপ শিক্ষা মনকে মুক্তি দিতে পারে না, শক্তিও দিতে পারে না। ... যে শিক্ষা মনকে মুক্ত ও শক্তিশালী করতে পারে না সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।[৩]

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পূর্ণ তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন। তিনি বলেছেন : আরবী, ফার্সী, উর্দু বা মাদ্রাসা মক্তবের মোহে পড়ে মুসলমানদের যে কি অনিষ্ট সাধন হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। এই শিক্ষাতে বুদ্ধি কোনরূপ প্রসার লাভ করে না। ইহাতে অযথা সময়, শক্তি ও অর্থের ব্যয় হয়। ... মাদ্রাসা শিক্ষা বহু কারণে আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। এই গোটা পদ্ধতিটাই বিজ্ঞানসম্মত নয়।"[৪]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেট সদস্য এবং অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সাবেক এ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর) খান বাহাদুর আহছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫) ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে মুসলমানরা যাতে ইংরেজি শিক্ষা আহরণ করে জাগতিক সভ্যতায় সমকক্ষতা অর্জনে সমর্থ হয়, এমন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন :

> মোছলমান শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ মক্তব যে রূপ প্রয়োজন তদ্রূপ বিশেষ শ্রেণীর মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়েরও প্রয়োজন আছে। ... ইংরেজি শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে, তবে তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন যেন এতদসঙ্গে ইছলামের আদর্শ, সভ্যতা এবং ধর্ম-প্রাণতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে।[৫]

কাজী মোতাহার হোসেন পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাকে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর ভাবেন নি। এ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল ধর্মশিক্ষা দেওয়া হতো এবং তা ছিল অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কণামাত্রও এই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের গোচরীভূত হওয়ার উপায় ছিল না। ফলে কালের ভাবধারার গতিকে উপলব্ধি করে কোরান হাদিসের অমূল্য সম্পদকে যুগের চাহিদা মোতাবেক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের ক্ষমতা তারা রাখত না। অথচ ধর্ম-প্রভাবিত ও ধর্মান্ধ মুসলমানচিত্তে ইংরেজি শিক্ষিতদের তুলনায় এই মোল্লাদের প্রভাব ছিল অধিক। কাজী মোতাহার হোসেন এই জাতীয় মৌলভীদের যোগ্যতা ও চিন্তাচেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

> আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানের কথা উল্লেখ করিয়া রাখি। ইঁহারা ধর্ম ভাষায় শিক্ষিত মোল্লা-মৌলভী ও প্রচারক সম্প্রদায়। ধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে এখনও জনসাধারণের চিত্তে ইংরেজী শিক্ষিতদের অপেক্ষা ইঁহাদের প্রভাব অধিক। ...কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিতে যে মুক্তবুদ্ধি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বর্তমান জগতের সংঘটনসমূহের কার্যকারণ সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক, তাহা অনেকেরই নাই।[৬]

উপর্যুক্ত মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, মাদ্রাসার অসম্পূর্ণ বিদ্যা দ্বারা মৌলভীরা এক দিকে যেমন বৈষয়িক জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হচ্ছে অপর দিকে যে ধর্মীয় কারণে তারা মাদ্রাসায় যাচ্ছে সে-ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে তাদের কূপমণ্ডূকতা ও ধর্মান্ধতার প্রভাব পড়ছে সমাজের ওপর। কাজী মোতাহার হোসেন তাই মুক্তবুদ্ধি, ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতির স্বার্থে এই পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমর্থন করেন নি। সমকালীন প্রগতিশীল ও সমাজহিতৈষী শিক্ষাবিদদের ন্যায় তিনিও স্পষ্ট করে বলেছেন, 'পুরাতন মাদ্রাসা পদ্ধতির শিক্ষা অপেক্ষা বর্তমান ইংরেজি পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ অধিক হয়।'[৭]

পুরাতন মাদ্রাসা পদ্ধতি বলতে মোতাহার হোসেন ওল্ড ও নিউস্কীম উভয় পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাকে বুঝিয়েছেন বলে মনে হয়। কেননা পুরাতন পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে তিনি নবপদ্ধতির কথা উল্লেখ না করে ইংরেজি পদ্ধতির শিক্ষার কথা বলেছেন।

এছাড়া 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকার ১৩৪০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত মোয়াজ্জিন সম্পাদকের 'এছলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক অভিভাষণের সমালোচনায় কাজী মোতাহার হোসেন উক্ত পত্রিকার শ্রাবণ (১৩৪০) সংখ্যায় যে অভিমত প্রকাশ করেন তাতেও ওল্ড স্কীম বা নিউ স্কীম কোন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাকে যে তিনি সমর্থন করেন নি তা সহজেই বোঝা যায়।[৮]

কাজী মোতাহার হোসেন উক্ত অভিভাষণের বেশ কিছু বক্তব্যকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বলে তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য :

> যে-কোন মাদ্রাছায় শিক্ষা লাভ করিলেই স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি আড়ষ্ট না হইয়া যায় না। যাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি বিকাশ লাভ করিতে পারে না, যাহার জীবনে কোন প্রশ্ন নাই, জিজ্ঞাসা নাই, সে ব্যক্তি হিতকার্য্য করিতে যাইয়া অহিতই করিয়া বসে এবং তাহার ঈমান কখনও সুদৃঢ় হয় না; তাই আল্লাহর, রছুলের প্রতি তাহার তেমন ভয়ও থাকে না। এই শ্রেণীর লোকই অতি ভয়াবহ। এই ভয়াবহ লোকগুলি আমাদের সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই সমস্ত অনুপযুক্ত মাদ্রাছায় শিক্ষা না পাইলে এই প্রকৃতির হইত না। ... মাদ্রাছায় শিক্ষালাভ করিলেই ভিক্ষাবৃত্তিটি চরিত্রের একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায়। আলেমের বেশ ধরিয়া গরীব লোকের ঘাড়ে চড়িয়া পাল্কী যোগে এছলাম জারী করিবার সন্ধান মাদ্রাছার শিক্ষা প্রণালীই বলিয়া দেয়।[৯]

অবশ্য উক্ত অভিভাষণে জগৎসভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে ইসলামের সৌন্দর্যকে সঠিকরূপে মানুষের কাছে উপস্থাপন করে হিংসা-দ্বেষ, সংকীর্ণতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় জর্জরিত জগৎকে প্রেম ও শান্তি দিতে নিউস্কীম মাদ্রাসাকে 'মন্দের ভাল' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[১০]

৩.

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে কাজী মোতাহার হোসেনের চিন্তা ও মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতার জন্য তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার সমালোচনা করেন নি। বরং ধর্মের নামে অন্ধশিক্ষা যেভাবে দেশে প্রাধান্য বিস্তার করে বাঙালি মুসলমানকে পশ্চাদ্‌গতি করে রেখেছিল, বাস্তব কারণে তিনি তা সমর্থন করতে পারেন নি। কেননা কেবল পরকালীন সাফল্য লাভের আশায় যে ছাত্ররা মাদ্রাসায় 'দ্বীন-ই-ইলম' শিক্ষা করতে যেতো তারা সেখানে অর্জিত বিদ্যা দ্বারা যেমন ধর্মকে সঠিক মেজাজে অনুধাবন করতে সক্ষম হতো না তেমনি ইহকালীন চাহিদা মেটানোর মতো কোন সাফল্যজনক উপায়ও তাদের ছিল না, যার অনিবার্য পরিণতিতে তারা মসজিদে ইমামতি করে, গ্রামের কারো মৃত্যু হলে ভোজের ও আয়ের পথ প্রশস্ত হলো মনে করে খুশি হতো। বাড়ি বাড়ি মিলাদ পড়ে টাকা পয়সা গ্রহণ, কাফনের কাপড়ের উদ্বৃত্ত অংশটুকু আত্মসাৎ, কোরবানি করলে 'কল্লা মোল্লার প্রাপ্য' ফতোয়া দিয়ে পশুর মাথা ও চামড়া হস্তগত করা প্রভৃতি হীন মানসিকতাসম্পন্ন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতো। এমনকি অর্থের জন্য তারা খোদমতলবী স্বার্থান্বেষী ফতোয়া প্রদানের ন্যায় অনৈতিক কাজ করতেও কুণ্ঠিত হতো না। যে সুদখোর হুজুরকে দাওয়াত করে আপ্যায়ন করে ও নজরানা বাবদ টাকা দেয় তার বাড়িতে খাওয়া জায়েজ, যে সুদখোর তাকে দাওয়াত করে খাওয়ায় না বা নজরানা দেয় না তার বাড়িতে খাওয়া হারাম; পাঁচ টাকার স্থানে পঁচিশ টাকা পেলে এক জনের বিবিকে অন্যের সাথে নিকাহ্ দেওয়া, শরিয়তের নিয়ম পালনের একটু ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে বিবি তালাকের ফতোয়া দেওয়া প্রভৃতি ইসলামের বিধিবহির্ভূত কাজ করে বেড়াতো।

কাজী মোতাহার হোসেন মোল্লা মৌলভী তথা আলেমসমাজকে নায়েবে রসূল হিসেবে মনে করেছেন। তাঁরা শরিয়তের যথাযথ জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন, সে

মোতাবেক সাধারণ লোকদের শিক্ষা দান করবেন এবং জাগতিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান দেওয়ার যোগ্য হবেন এমন প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি বলেছেন :

> তাঁহারা নায়েবে রসুল বা প্রেরিত পুরুষের প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ লোকের শিক্ষক। জীবনের উদ্দেশ্য কি, জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় কি, আল্লাহর সহিত আমাদের কি সম্পর্ক, ধর্মবিধির তাৎপর্য কি এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহারা লোকের প্রশ্ন ও সন্দেহের মীমাংসা করিবেন।[১১]

এ ছাড়া ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে চলনসই জ্ঞান ব্যাপকভাবে বিতরণের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে — সাত থেকে বার বছর বয়েসের মধ্যেই ইসলামী শরা-শরিয়তের কতকগুলো অত্যাবশ্যক বিষয় মুখস্থ করার এবং বাকী কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া উচিত।'[১২]

কিন্তু সবাইকে ধর্মশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বানানোর উদ্দেশ্যকেও তিনি সমর্থন করেন নি। কেবল যাঁরা ধর্মপ্রচারক হবেন তাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে পরিপূর্ণ, বাস্তব ও যুগোপযোগী জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলে তিনি মনে করেছিলেন। এবং প্রয়োজনে তাঁদেরকেও ইংরেজি শিক্ষিতদের নিকট যেতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।[১৩]

কাজী মোতাহার ধর্মীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ছাত্রদের শিক্ষা দানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছিলেন কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ যাতে জাগ্রত না হয় সে-দিকেও তিনি সতর্ক ছিলেন। সে জন্য-হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তারা যেন স্কুল থেকেই শিক্ষা লাভ করতে পারে সে-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের চেষ্টা না করে যথাযথ ভাবে স্বধর্ম ও স্ব-সমাজের শ্রেষ্ঠাংশটুকু লোকের সামনে তুলে ধরতে। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে এমন শিক্ষার বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন :

> মুসলমান ও হিন্দুর জন্য পৃথক স্কুল করিলে চলিবে না। ধর্ম শিক্ষা (অর্থাৎ ধর্মের অনুষ্ঠান বাদ দিয়া উহার ইতিহাস ও আদর্শগত অংশ) স্কুল হইতে বর্জন করিলে চলিবে না, বরং হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেক ছাত্র হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কালচার সম্বন্ধে যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, স্কুলের শিক্ষাতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।[১৪]

'ধর্ম ও শিক্ষা' (১৯৩০) শীর্ষক প্রবন্ধেও তিনি একই ধরনের কথা বলেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমাজের জন্য কল্যাণকর ভাবেন নি। তিনি লক্ষ করেছেন এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কল্যাণের পরিবর্তে সংকীর্ণ ও বৈরী মনোভাবের জন্ম দেয়। কাজেই এই অকেজো বিদ্যার বিলোপের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন :

> ...টোল, মাদ্রাসা, হিন্দু কলেজ, ইসলামিক কলেজ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। যেখানে সংকীর্ণতা ও অপ্রেম বিরাজ করে, পরস্পরকে বুঝবার কোন আগ্রহ বা অবসর নাই, সেখানে কোন বৃহৎ চিন্তা বা কর্মের সূচনা হওয়া সুদূরপরাহত।[১৫]

উপর্যুক্ত মতামতের আলোকে বলা যায়, কাজী মোতাহার হোসেন ধর্মীয় জ্ঞান প্রদানের আবশ্যকতা অনুভব করছেন কিন্তু ধর্মশিক্ষার জন্য পৃথক কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা অনুভব করেন নি। তিনি লক্ষ করেছেন ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা গঠনে সহায়ক নয়, অন্যদিকে যুগের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য মানবসম্পদ তৈরিও এ শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ জাতিকে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই কাজী মোতাহার হোসেনের যৌক্তিক অভিমত হলো :

> আপন পরিবেষ্টনের প্রতি মুক্তদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবার এবং যুগোপযোগী সমস্যা সমাধানের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা জন্মে ছাত্রদিগকে সেই রূপ শিক্ষা দিতে হইবে।[১৬]

৪.

শিক্ষায় ভাষা-প্রসঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার বাহন হিসাবে যেখানে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষা গুরুত্ব পেয়েছে, মাতৃভাষা হয়েছে অবহেলিত, সেখানে বিষয়টির গুরুত্ব যে কত বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজী মোতাহার হোসেনের শিক্ষাচিন্তা আলোচনায় তাই শিক্ষার বাহন হিসেবে তাঁর ভাষা সংক্রান্ত মতামত পর্যবেক্ষণের সবিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষার বাহন হিসেবে ভাষা শিক্ষার্থী তথা সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উপর যে কী সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে কাজী মোতাহার হোসেন তা

ভালভাবে অনুধাবন করেছিলেন। বাঙালি মুসলমানের ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা সংক্রান্ত আবেগতাড়িত অবাস্তব সিদ্ধান্তের কারণে কী শোচনীয় দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল তাও তার অবিদিত ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতিতে সর্বনিম্ন পর্যায় মক্তব থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে একাধিক ভাষায় বিদ্যা অর্জন করতে হতো। বলা বাহুল্য, এ অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা কখনোই কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে পারে নি।

পাঠশালায় যেখানে শিক্ষার্থীকে পড়তে হতো একটি ভাষা... মাতৃভাষা, সেখানে মক্তবের শিক্ষার্থীকে পড়তে হতো তিনটি ভাষা — মাতৃভাষা, আরবি এবং উর্দু। আর নব পদ্ধতির মাদ্রাসায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়তে হতো চারটি ভাষা অর্থাৎ অতিরিক্ত ইংরেজি। এভাবে মুসলিম শিক্ষার্থীর মাথায় তার মন ও মস্তিষ্কের শক্তি বিচার না করে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়েছিলো। কাজী মোতাহার হোসেন বাল্যকালে শিক্ষার্থীর মাথায় একাধিক ভাষার বোঝা চাপানোর রীতিকে আদৌ সমর্থন করেন নি। তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে একটি এবং তার এক দশক পরে প্রকাশিত আরেকটি প্রবন্ধে শিক্ষার বাহন কি হবে সে-বিষয় এবং ভাষা ও শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। 'শিক্ষা প্রসঙ্গে' (১৩৬৫) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> আমার মনে হয় দশ বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা বা তার বর্ণমালা শেখান উচিত নয়। এগার ও বারো বছর বয়সে আরবি বর্ণমালা এবং আমপারা শেখান দরকার। এই বর্ণমালা আয়ত্ত হলে ছোট ছোট দুই একখানা উর্দু বইও ছেলেরা এই সঙ্গে বা মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ে শেষ করতে পারে।[১৭]

দশ বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষা না দেওয়া সম্পর্কিত কাজী মোতাহারের চিন্তা প্রশংসনীয় হলেও এগার বার বছর বয়সে আরবি বর্ণমালা শিক্ষার চিন্তাকে সমর্থন করা যায় না। সন্দেহ নেই যে ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানকে ব্যাপকভাবে বিতরণের জন্য তিনি এ চিন্তা করেছেন কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরবি অক্ষরজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করার ভাবনা আমাদের বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত নয়। মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ও যুক্তিবাদী লেখক কাজী মোতাহার হোসেন কেন এ সিদ্ধান্ত নিলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাছাড়া এটি তাঁর চিন্তার স্ববিরোধিতারও বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। কেননা তিনি প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা দেওয়ার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অথচ এগার, বার বছর বয়সকে যে তিনি প্রাথমিক শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত ভেবেছেন তা উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়।

তদুপরি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন এবং পরিপূর্ণ শিক্ষার পটভূমি বিবেচনা করে তিনি যে মত প্রকাশ করেছেন তা সারগর্ভ। তিনি বলেছেন :

> ... প্রাথমিক শিক্ষায় শুধু মাতৃভাষা, পরে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর শেষ তিন, চার বছর এর সঙ্গে প্রয়োজন মত অন্য একটি বা দুটি ভাষা জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে এই সব দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষার শিক্ষাও দ্রুততর এবং অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হবে। শিক্ষার বাহন অবশ্যই মাতৃভাষা হবে। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে হয়ত ইংরেজী ভাষাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। কিন্তু এর উপর জোর দেওয়া এখন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। রাষ্ট্রের ভিন্ন প্রদেশীয় লোকদের বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে আমাদের বিবেচনায় পণ্ডিতি ও মৌলবী-উর্দুর মাঝামাঝি ধরনের উর্দুই সবচেয়ে বেশী উপযোগী হবে। এই দিক দিয়ে বর্তমানে উর্দু ভাষারও সংস্কার করা আবশ্যক। ... ম্যাট্রিকুলেশনের শেষ তিন চার শ্রেণীতে এ ভাষা শিক্ষা দিলে বোধ হয় ছাত্ররা মোটামুটি ধরনের ব্যাপক কালচারের অধিকারী হতে পারে; আর যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষা শেষ করে তারাও অকারণ ভাষা নিষ্পেষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শুধু মাতৃভাষার সাহায্যেই আবশ্যক জ্ঞান ও স্বকীয় কালচারের স্বাদ পেতে পারে।[১৮]

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে অর্থাৎ জাতীয় ঐকমত্য এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগসুবিধা লাভের স্বার্থে ইংরেজির চেয়ে উর্দুকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করেছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃত কালচার মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ইউনিভার্সিটিতেও মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। তাহলে উচ্চশিক্ষার সহায়তার জন্য ইংরেজি জানবার প্রয়োজন হবে না, তবে যারা রাষ্ট্রদূত হবে, বা বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে, তাদের জন্য প্রয়োজন মত ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, চীনা, রাশিয়ান প্রভৃতি বিবিধ ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সকল ছাত্রই রাষ্টদূত বা বৈজ্ঞানিক হবে না। তাছাড়া মন্ত্রী, এমন কি প্রধানন্ত্রী হতে হলেও ইংরেজী জানা অপরিহার্য নয়, ...সঙ্গে দোভাষী থাকলে তাদের মধ্যবর্তিতায় ভাষা আদানপ্রদান করা চলতে পারে। অবশ্যই উচ্চ কর্মচারী, উৎকৃষ্ট নাগরিক বা সফল ব্যবসায়ী হতে হলে কালচার বা তাহজীব একান্তই জরুরী। এই কালচার ইংরেজী ভাষাতেই আয়ত্ত করতে হবে, ...

তার কোনও মানে নেই। আসল কালচার বলে তাকেই যা লোকের মনে প্রাণে প্রবেশ করছে। সে কালচার মাতৃভাষার ভিতর দিয়েই আত্মস্থ হয়ে থাকে।[১৯]

সময়ের দাবির প্রেক্ষিতে উর্দু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেও 'ধর্মীয় অন্ধ উন্মত্ততায়' বাঙালি মুসলমানের উর্দুর প্রতি মোহকে কাজী মোতাহার মারাত্মক বিভ্রম মনে করেছেন। উর্দু সম্বন্ধে বাঙালি মুসলমানদের ভ্রান্ত ধারণার অসারতা প্রমাণ করে তিনি লিখেছেন :

> উর্দুর দুয়ারে ধর্না দিয়ে আমাদের কোন কালেই যথার্থ লাভ হবে না। আল্লাহর কাছে উর্দু বেশী আদরের কিংবা বাংলা হতাদরের সামগ্রী নয়। উর্দু আরবী থেকে গৃহীত বলেই যে উর্দু ভাষা মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা একথাও যথার্থ নয়। ... আমি উর্দু ভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্যসত্যই মারাত্মক মনে করি। ... আমাদের মোহাবেশ কাটাতে হবে, চোখ মেলে বিষয় ও ব্যাপারের যাচাই করে নিতে হবে। সেই চলাই হবে আমাদের প্রকৃত স্বাধীন চলা। এর একমাত্র সহায় হচ্ছে মাতৃভাষার যথোপযুক্ত চর্চা এবং জীবনে যা কিছু সুন্দর, লোভনীয় বা বরণীয় মাতৃভাষার মারফতেই তা সম্যক অর্জন করা। আমাদের এই মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের প্রকৃত উন্নতি হতে পারে না।[২০]

কাজী মোতাহার মনে করতেন ভাষার বাধা একটি জাতিকে পঙ্গু করে দিতে পারে। তিনি লক্ষ করেছেন ইংরেজ আমলে রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার বাহন ইংরেজি থাকার কারণে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান ব্যাপক মানসিক শক্তি এবং দ্বিগুণ সময় ব্যয় করেও যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারে নি। উপরন্তু পূর্ব বাংলার মুসলমান বাংলাকে অবহেলা এবং ধর্মীয় ভাষা মনে করে উর্দুর প্রতি অহেতুক আকর্ষণের কারণে আরও পিছিয়ে পড়েছিল।[২১] এ পশ্চাৎপট বিবেচনা করে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাদীক্ষায় এমন এক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন যার মধ্য দিয়ে সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে নিজেকে সামিল করে নিতে সক্ষম হবে। তিনি বলেছেন :

> ...শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রথম নিজের মাতৃভাষা তারপর পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান ভাষা, তারপর সব শেষে বিদেশীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ভাষা শিক্ষা করবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ করতে পারলেই আমাদের আত্মমর্যাদা বাড়বে, প্রকৃত জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি হবে, আর বৈদেশিকদের সঙ্গেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান আসনে বন্ধুত্ব স্থাপন করবার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষা এবং উন্নতির এই একমাত্র পন্থা।[২২]

৫.

উনিশ শতকের শেষ তিন দশক আর বিশ শতকের প্রথম দু-দশক এ অর্ধ শতাব্দীকে বাঙালি মুসলমানের জন্য যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মূলত এ সময়ে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হয় জাগরণ প্রচেষ্টা। আর তখন থেকেই তাদের মধ্যে জীবন ও সমাজের নানাবিধ বিষয় নিয়ে শুরু হয় তর্কবিতর্ক। এ বিতর্কের একটি অন্যতম বিষয় ছিল নারীশিক্ষা। কেননা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশেষত প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীসমাজ তখন শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগতি সাধন করে নিজেদের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেকটা অগ্রগামী, অথচ বাঙালি মুসলিম নারী-সমাজের জন্য শিক্ষা ছিল তখনও নিষিদ্ধপ্রায়। তাই নারীশিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে কোন শিক্ষা কীভাবে কতখানি তাকে দেওয়া সঙ্গত এসব আলোচনাই ছিল মূলত নারীশিক্ষার অন্তর্গত বিষয়।

নারীজাতির উন্নতির জন্য যারা ভাবিত ও চেষ্টিত ছিলেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই উন্নতির প্রধান উপায় দেখেছিলেন তাঁদের শিক্ষার মধ্যে। বিদুষী নারী বেগম রোকেয়া নারীজাতির দুর্দশার জন্য শিক্ষার অনগ্রসরতাকেই দায়ী করেছেন। নারী শিক্ষার বিরোধিতাকারীদের তিনি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন, 'যে সকল মোল্লা স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় তারা ছদ্মশেী শয়তান।'[২৩] কাজী নজরুল ইসলাম স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে স্ত্রী-জাতিকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখায় তিনি বেদনাহত হয়েছেন। 'তরুণের সাধনা" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি।[২৪]

কাজী মোতাহার হোসেন বিশ্বাস করতেন কুসংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন বাঙালি মুসলিম নারীকে সত্যিকার অর্থে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা। সমাজের নারীপুরুষের মধ্যকার যে ব্যবধান তাও শিক্ষার অভাবে। অথচ সমাজোন্নয়নের প্রশ্নে এ ব্যবধান অপসারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই তিনি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত স্ত্রীজাতিকে শিক্ষার আলোয় সত্যিকার পথের দিশা দিতে চেয়েছেন, চেয়েছেন তার

ভিতরকার কুসংস্কারসমূহকে দূর করে তার মনকে মুক্ত করে তুলতে এবং তাকে উন্নত জীবনের সংস্পর্শে নিয়ে যেতে। তিনি লিখেছেন :

> আগেই বলেছি মুসলমানের শিক্ষার অভাবের কথা। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, জগতে এর তুলনা নেই।...অনেক সময় অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা স্ত্রীগণকে গর্বিত স্বামীর দল তুচ্ছ করে দূরে সরিয়ে রাখে, ...যেন তারা মানুষই নয়, যেন বুঝালেও তারা কিছুই বোঝে না। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। বেশীর ভাগ মেয়েই চমৎকার বুদ্ধি ধরে, তাদের কল্পনা ও ধারণাশক্তিও বেশ প্রখর; অনেক সময় তারা স্বামীর পুঁথি-পড়া উদ্ভট থিওরীকে সহজ ব্যবহারিক বুদ্ধি দ্বারা বেশ উড়িয়ে দিতে পারে। তাই স্ত্রী অল্প-শিক্ষিতা হলেও স্বামী যত্ন করলে ধীরে ধীরে তাকে বেশ চলনসই করে নিতে পারে... আস্তে আস্তে তার কুসংস্কারগুলি দূর করে তার মনকে উদার করে তুলতে পারে এবং বাইরের আলো বাতাসের সঙ্গে একটু পরিচয় ঘটিয়ে তার জ্ঞানের পরিসর যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে, ...[২৫]

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কাজী মোতাহার নারীকে শিক্ষাদানের আবশ্যকতা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু কী ধরনের শিক্ষা তাদের তিনি দিতে চেয়েছেন সেটা বিচার্য। কেননা নারী-পুরুষ সম্পর্কে সামাজিক আদর্শ সর্বত্র এক রকম নয়। এ ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ ভিন্ন। আধুনিক কালে পাশ্চাত্যের আদর্শ এক রকম বিশ্বজয়ী হলেও মোতাহার হোসেন তা হুবহু অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। অবশ্য নারীদের জন্য তিনি প্রগতিশীল শিক্ষাকেই আবশ্যক মনে করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি নারী সমাজকে জাগাতে চেয়েছেন। সমাজের নারীকেন্দ্রিক বিবিধ সমস্যার সমাধানও তিনি তাদের যথাযথ শিক্ষার মধ্যেই লক্ষ করেছেন। কিন্তু সমকালে[২৬] নতুন আমদানীকৃত স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে তিনি কিছু ত্রুটি লক্ষ করেছিলেন। তার মতে এ শিক্ষা শিক্ষার প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারায় সমাজের জন্য বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার ভয়ে নারী বিয়ে করতে অস্বীকার করার ফলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। তাঁর ভাষায় :

> বর্তমান প্রণালীর স্ত্রী-শিক্ষা বাঙালী সমাজে নতুন আমদানী এই জন্য উহা কিরূপ হইলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। ইতিমধ্যেই কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে। তাহার প্রথমটি হইতেছে... বিদুষী মহিলাদের অনেকের বিবা-বিমুখতা। এইরূপ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি-নিরোধ সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই

হানিকর। ...মনে হয় মহিলাদের বিবাহবিমুখতার একটি কারণ উপযুক্ত বরের অভাব (উপযুক্ত বর বলতে কন্যা অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত, ধনবান বা প্রচুর উপার্জনক্ষম, নিটোল স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ বুঝায়, যাহার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়)। আর একটি কারণ, শিক্ষিত পুরুষের আত্মপরায়ণতা আর শিক্ষিতা মহিলার নবোন্মেষিত আত্মজাগরণ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি।[২৭]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের নর-নারীর সম্পর্কগত অশুভ দিকগুলো কাজী মোতাহারকে শঙ্কিত করে তুলে থাকতে পারে। নতুন আমদানিকৃত স্ত্রীশিক্ষার ফলে নারীদের একাংশের স্বাতন্ত্র্যপ্রীতির অজুহাতে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে উন্নাসিক মনোভাব তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

এটা ঠিক যে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত দিকনির্দেশনামূলক কোনো বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেন নি কিন্তু সমকালে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে যে নানা রকম বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল সে-প্রসঙ্গে তিনি নির্লিপ্তও থাকেন নি। বস্তুত সামাজিক সমস্যার কারণেই তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন। সেজন্য সামাজিক প্রবন্ধের আলোচনার মাঝেই তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলেছেন। সেখানে তিনি প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। নারী আধুনিক জীবনের সংস্পর্শে এসে উদার ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠুক সে শিক্ষাই তিনি তাদের দিতে চেয়েছেন।

৬.

কাজী মোতাহার হোসেনের শিক্ষাচিন্তায় জীবনঘনিষ্ঠ ও বৃত্তিমূলক বা কর্মমুখী অথবা কারিগরি শিক্ষা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। পার্থিব জীবনে কাজে আসবে না, বেকারত্ব সৃষ্টিকারী, অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে ব্যর্থ কিংবা হতাশার দিকে ঠেলে দেয় এমন শিক্ষাকে তিনি সমর্থন করেন নি। কেননা তাঁর শিক্ষাচিন্তার লক্ষ্য ছিল দেশের আর্থসামাজিক মুক্তি ও উন্নতি।

বৃটিশ শাসনামলে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের মানুষের পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট তথা জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছিল। মোতাহার হোসেন একে জাতীয় জীবনের জন্য চরম ক্ষতিকর বিবেচনা করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কৃষিনির্ভর আমাদের দেশের আর্থিক উন্নতির প্রতি দিকনির্দেশনামূলক শিক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রদান করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> আমাদের দেশ আবহমান কাল থেকেই কৃষিপ্রধান রয়েছে আরও বহুকাল যাবৎ এমনই থাকবে। অথচ কোন্ ঋতুতে কোন্ ফসলের চাষ হয়, কি কি ফল জন্মে, এসব উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় যায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ বাড়ান যায় কিনা... এসব জীবন সংশ্লিষ্ট জরুরী বিষয়ের আলোচনা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে আদৌ দেখা যায় না। মনে হয় যেন এসব এমন জিনিস যা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাবারই যোগ্য নয়। ইংরেজ আমলে আমাদের শিক্ষার ভিতর দিয়ে সর্বসাধারণকে তাচ্ছিল্য করবার যে মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে, আসলে এ ব্যাপারটি তারই এক উৎকট প্রকাশ। বর্তমানে অবশ্যই এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে, গতর খাটান পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে হবে, আর দেশের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।[২৮]

ইংরেজ শাসনের অবসান তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোতাহার হোসেনের উক্ত ভাবনার আগে ইংরেজ আমলেও তিনি কৃষকসমাজের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার শোষণ ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য চিন্তা করেছিলেন ...

> জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার যতদিন না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত পুস্তকের শিক্ষা ছাড়াও নানা বিষয়ে যে সমস্ত মূলসূত্র সামান্য বুদ্ধিমান লোকে বুঝিতে পারে, সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়াই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।[২৯]

আর্থিক মুক্তির দিশা প্রদান যেমন তাঁর শিক্ষাচিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি ছাত্র-সমাজকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয় কিংবা বেকারত্ব সৃষ্টি করে এমন শিক্ষারও তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তিনি লক্ষ করেছেন যে আমাদের সমাজব্যবস্থায় হস্তকর্ম তথা কারিগরি বিদ্যার প্রতি অশ্রদ্ধা কিংবা আগ্রহ না থাকায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তত বেশি গড়ে ওঠে নি, আর বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে ছাত্ররা অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার উচ্চ ডিগ্রি নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে হতাশার দিকে ধাবিত হয়। অনেক সময় কাগজ কলমে ডিগ্রি হাসিল করেও বেকারত্বের অভিশাপে ভোগে। অথচ চাহিদা মোতাবেক বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নতি দ্রুত সাধিত হতো এবং ছাত্রসমাজও বেকারত্ব ও হতাশার হাত থেকে মুক্তি পেতো। এ প্রসঙ্গে মোতাহার হোসেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> অনেক ছাত্র প্রকৃতিগতভাবেই সর্বোচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত নয়; তবু দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতি থাকাতে, অগত্যা গতানুগতিক শিক্ষার পথেই দুরূহ পদক্ষেপ করতে বাধ্য হচ্ছে। এটি আমাদের সমাজব্যবস্থা, হস্তকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন ব্যাধি।[৩০]

কোন স্তর থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুরু হবে তার নির্দেশনা কাজী মোতাহার হোসেনের রচনায় লক্ষ করা যায়। তিনি কমপক্ষে নবম শ্রেণী অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সবার জন্য সাধারণ শিক্ষা প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে চলনসই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এটাকে তিনি বৃত্তিমূলক বা উচ্চ শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ মনে করেছেন। তিনি মনে করেছেন শিক্ষার এই পর্যায় থেকে ছাত্র-ছাত্রীকে বাছাই করে তাদের যোগ্যতা ও প্রবণতার আলোকে বৃত্তিমূলক কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে। তিনি বলেন :

> ...নিম্ন শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে অন্ততঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞ সামাজিক মানুষ হবার জন্যই, শুধু বর্ণপরিচয় নয় অন্তত অষ্টম বা নবম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষাতেই খানিকটা গদ্য ও পদ্য সাহিত্য; কিছু পাটীগণিত, জ্যামিতি ও বীজগণিত; পাকিস্তান ভারত ও ভূ-মণ্ডলের কিছু পরিচয়; কিছু ইতিহাস, সমাজ, নীতি, ধর্ম, পৌরাণিক কাহিনী; ড্রয়িং, ড্রিল, সঙ্গীত ও সাধারণ প্রকৃতি পরিচয়ও হওয়া আবশ্যক। এই সাধারণ ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কলেজীয় বা বিশ্ববিদ্যালয়িক উচ্চ শিক্ষা।[৩১]

কর্মমুখী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও মোতাহার হোসেন সাধারণ শিক্ষার সংকোচনের কথা বলেন নি। বস্তুত তিনি উভয় প্রকার শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, এক সময় যে শিক্ষা কেবল রাজা-মহারাজা, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোকের আয়ত্তে ছিল, কালের বিবর্তন ও সভ্যতার অগ্রগতিতে তা সর্বশ্রেণীর মানুষের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। এখন সকলেই লেখাপড়া শিখতে চায় এবং অবাধ সামাজিক উন্নতি চায়। এই মৌলিক ও গণতান্ত্রিক দাবী পূরণ করার জন্য ব্যাপক হারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। আর সে শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত মানের ও যুগোপযোগী হওয়াও বাঞ্ছনীয়। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য কেবল কর্মমুখী শিক্ষা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তি গড়ার জন্য যে সাধারণ শিক্ষা আবশ্যক তার জন্য বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্যও প্রয়োজন উচ্চশিক্ষার। কাজী মোতাহারের তাই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত :

> অধিক সংখ্যক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় চাই; অথচ উপযুক্ত শিক্ষার গুরুতর অভাব ঘটেছে। বিশেষ করে একজন মহাপণ্ডিতই সব বিষয় শিক্ষা দিতে পারবে, তেমন অবস্থা আর নাই। এখন কর্ম বিভক্তি ও বিষয় বিভক্তির যুগ এসে পড়ছে। এই জ্ঞান বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিক্ষার যুগেও কিছু মানবীয়তামূলক শিক্ষা... অর্থাৎ গণিত, যুক্তিবিদ্যা, সঙ্গীত, ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, ধর্মবোধ প্রভৃতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে।[৩২]

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল প্রকার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মমুখী ও উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে কাজী মোতাহার হোসেন যে মত পোষণ করেছেন আমাদের বিবেচনায় তা বাস্তবানুগ এবং অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বাহী। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বেকার এ সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি অনুসরণের উপযোগী বলে আমাদের ধারণা।

৭.

বাঙালি মুসলমান তথা বাঙালি জাতির সার্বিক উন্নতি ও বিকাশের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য কাজী মোতাহার হোসেনকে বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানে আমাদের বাল্যশিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক না থাকায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বাঙালি মুসলমানের অধঃপতনের জন্য এটিকে তিনি অন্যতম কারণ বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে উন্নত দেশে দুই থেকে পাঁচ-ছয় বছরের শিশুদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। সেখানে এ বয়সের শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের স্কুলের ব্যবস্থা করে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সহজ ও স্বাধীনভাবে শিক্ষা প্রদান করে তাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোকে বিকশিত করে তোলা হয়। ফলে কোনোপ্রকার মানবিক চাপ ছাড়াই তারা আনন্দের সাথে শিক্ষা লাভ করে। আমাদের দেশে বাল্যশিক্ষার ঐ জাতীয় কোনো ব্যবস্থা না থাকায় কোমলমতি শিশুদের বিজাতীয় তথা ইংরেজের অনুকরণে বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষা প্রদানের চিন্তাকে তিনি সমর্থন করেন নি। শিক্ষাকে তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কাজেই তাঁর মতে যে শিক্ষা শিশুদের দেশের মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলবে সে শিক্ষা দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হবে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> আমরা বিলেতি পদ্ধতির স্কুলে কোমলমতি ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে ইংরেজী বোল শেখাচ্ছি, আর এইসব ছেলেমেয়ে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে নিজেদেরকে দেশের লোকের থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শিখছে। এতে উক্ত স্কুলসমূহের পরিচালকদের অর্থাগমের সুবিধে হচ্ছে বটে, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেরা দেশের লোকের কাছে পর বনে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের বাল্যশিক্ষার কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকাতেই দেশের বড়লোকেরা বহু অর্থ ব্যয় করে এই ধরনের শিক্ষার সহায়তা করবার একটা মস্ত অজুহাত পেয়েছেন।[৩৩]

কাজী মোতাহার হোসেন বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ও সুবিজ্ঞ মতামত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সাত আট বছর বয়স থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম পাঠের সূচনার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এবং সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে চার পাঁচখানা সাহিত্যপুস্তক, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি ও গণিতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে শিক্ষাপ্রদানের কথা বলেছেন। সেই সাথে নামতা, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি মুখস্থ করানোর উপরও তিনি গুরুত্ব দিতে বলেছেন।[৩৪]

আধুনিক শিক্ষিত অনেকেই "পাশ্চাত্যের অনুকরণে" না বুঝে মুখস্থ করানোর রীতিকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু কাজী মোতাহার শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে বুঝাবার আবশ্যকতাকে স্বীকার করে নিয়েও বাল্যকালে মুখস্থ করানোর উপর অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করেন :

> আমাদের জ্ঞানের মধ্যে এমন কতকগুলো বিষয় আছে প্রচলিত রীতি বা বিশ্বাসের উপর যার প্রতিষ্ঠা। প্রথমেই বিশ্বাস না করে তর্ক আরম্ভ করলে শিক্ষার অগ্রগতি হতে পারে না। 'ক'কেন আগে হবে 'গ' কেন আগে হবে না... একথা আগে হৃদয়ঙ্গম করে পরে বর্ণমালা শিখব বলে যদি কেউ অপেক্ষা করতে থাকে তবে সেই অতি-পণ্ডিত আহম্মককে হয়ত আজীবন নিরক্ষরই থেকে যেতে হবে। শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলো বিষয় এত বার ঘুরে ঘুরে আসে যে সেগুলো আগেই মুখস্থ করে রাখলে প্রয়োগ থেকে অনেক সুবিধা হয়।[৩৫]

স্বাধীনতাপরবর্তীকালে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে কাজী মোতাহার দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটির পাশাপাশি বাল্যশিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি ধরে একই মন্তব্য করেছেন ।

> ... আরো গলদ রয়েছে। যেমন মুখস্থ করতে হবে, না বুঝে মুখস্থ করতে হবে। যেমন ১২ ×১২ = ১৪৪। এটা বুঝে জবাব দিলেই চলবে না, মুখস্থও রাখতে হবে।

> আমরা ছোট বেলায় যে নামতা পড়েছি, তা খুব উপকারী জিনিস ছিল। আরো ছিল একজন বলে যেত, আর সবাই আবৃত্তি করে যেত। এগুলো খবু উপকারী ব্যবস্থা।
>
> আজকাল যা পড়ানো হয় তাতে পরস্পরবিরোধী ধারণা জন্মে। এক সঙ্গে আমরা অনেক শিখাতে যাই। যাতে ছাত্ররা খেই হারায়ে ফেলে।[৩৬]

মোতাহার হোসেন বাল্যশিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটির জন্য মাতা-পিতার অজ্ঞতা, অদক্ষতা প্রভৃতিকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন মায়ের পেট থেকে পড়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হলেও তার আগে মাতা-পিতার মনোবৃত্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈহিক দোষ, গুণ প্রভৃতির প্রভাব উত্তরাধিকার সূত্রে শিশুর উপর বর্তে। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই অশিক্ষিত। তাই শিশুর পরিবেশ সৃষ্টি না করা এবং বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারার কারণে শিশুরা সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। এজন্য তিনি বয়স্কদের জন্য বিশেষ বিশেষ পুস্তক প্রকাশ করে ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।[৩৭]

সমাজের অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মার্জিত ও ভব্য করে তোলার জন্য এবং তারা যেন কথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয় সে জন্য তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চিন্তা করেছেন। 'বাঙালীর সামাজিক জীবন' (১৯৩২) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন

> অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষাটা যদি সর্বসাধারণের মধ্যে বাধ্যতামূলক হয়, তবেই এই অবস্থা হতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, নতুবা নয়।[৩৮]

এই বাস্তবমুখী ও জীবনসম্পৃক্ত চিন্তাকে আরো পরিপুষ্ট করেছে তাঁর বিশেষ সীমা পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাচিন্তা। শিক্ষাকে তিনি সব সময় মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে দেখেছেন। আর সেই অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে তার হৃদয় ছিল আন্তরিকতায় ঋদ্ধ। বিশেষ সীমা পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হলে 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'কে তিনি বলেন :

> আসলে এটা হচ্ছে শিক্ষার অধিকারের প্রশ্ন। এদেশে শিক্ষা ব্যয়সাধ্য। যার ফলে বড়লোকের ছেলে বিলেত পর্যন্ত যাচ্ছে আর মেধাসম্পন্ন গরীবের ছেলে সুযোগ পর্যন্ত পায় না। আর বিলেত থেকে ফিরে এলেই আমরা মাথায় তুলে রাখি। মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা হলে ভাল হত। সে রকম সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত যদি বিনে পয়সায় পড়ানো যেত তাহলে ভাল হত।[৩৯]

এছাড়া তিনি সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে মুসলমান শিক্ষার্থীকে ইসলামি শরা-শরিয়তের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুখস্থ করানো এবং বাকি কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দিতে চেয়েছেন। আর দশ বছর বয়সের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষার বর্ণমালা শেখানোর ঘোর বিরোধিতা করেছেন।[৪০]

৮.

শিক্ষাব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেন উদ্বিগ্ন ছিলেন। ক্রটিপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচি, মাতৃভাষা ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীনতা, শিক্ষাঙ্গনের বিরূপ পরিবেশ, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ঘাটতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা করেছেন এবং এসব সমস্যার সমাধানের জন্য সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন।

জাতিকে সুশিক্ষিত এবং সঠিক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পাঠ্যপুস্তক এবং সিলেবাস পরিকল্পিত এবং যথাযথভাবে প্রণীত হওয়া একান্ত জরুরি। কিন্তু আমাদের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস নানা ক্রটিপূর্ণ। এ বিষয়টি তিনি গুরুত্বসহকারে লক্ষ করেছেন। পাঠ্যপুস্তক কেমন হওয়া উচিত, কোথায় এর ক্রটি, তা নিরসনের উপায় কী, আর নিরসনের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ কী কী তা তিনি নির্দেশ করেছেন। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে তাঁর অভিমত...

> পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, যে শ্রেণীর জন্য পুস্তক লিখিত হচ্ছে তা' সেই শ্রেণীর মধ্যম রকম ছাত্র বা ছাত্রীর বোধগম্য হওয়া চাই। এদিক দিয়ে অনেক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক সত্যি সত্যি অনুমোদনীয় নয়। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করতে হলে আমাদের বর্তমান অবস্থায় কী যে করা দরকার, তা বেশ একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে। নৈতিকতার মান নেমে পড়ার ফলে, এবং কতকটা পাঠ্যপুস্তকের লেখক এবং বিচারকের বুদ্ধির ভ্রমে, অযোগ্য পুস্তকও যোগ্য বলে চালান হচ্ছে। বিশেষ করে বইয়ের ভিতরে কি আছে, তার চেয়ে রং চং কেমন, কাগজ, নক্সা প্রভৃতি কেমন, এই সব বাহ্য বিষয়ের উপরেই যেন অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ...যাঁরা সিলেবাস প্রণয়ন করেন তাঁদের আমরা বিশেষজ্ঞ বলেই মানি; তবু অঙ্ক ও বিজ্ঞানের সিলেবাসে এবং অন্যত্রও সচরাচর এমন সব প্রসঙ্গ থাকে যা নানা কারণে ক্রটিপূর্ণ।[৪১]

কাজী মোতাহার হোসেন শিশুদের বই আকর্ষণীয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন কিন্তু তিনি সর্বক্ষেত্রে বহিরাবরণের চেয়ে বইয়ের বিষয়বস্তু ও বর্ণনার সরসতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তিনি লক্ষ করেছেন যে সিলেবাসের অযৌক্তিকতার কারণে অনেক সময় ভাল গ্রন্থপ্রণেতাও অনুমোদিত না হওয়ার আশঙ্কায় ভাল বই লিখতে সাহস পান না। বাধ্য হয়েই তাঁরা অনৈতিকতার পথে পা বাড়ান এবং অপ্রধান ও খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করে পাঠ্যপুস্তক ভয়াবহ করে তোলেন। পাঠ্যপুস্তককে এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি উদগ্রীব ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রের এই অরাজক পরিস্থিতিতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমালোচনাসহ পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়নে যে পরামর্শ দিয়েছেন তা তাঁরই ভাষায় দেখা যাক...

> ...এজন্য ধীরস্থির শিক্ষাবিদদের কনফারেন্স ডাকার প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃত ধীরস্থির বা সুস্থচিত্ত শিক্ষাবিদ বেছে বার করবে কে? বর্তমান সামাজিক অবস্থায় শিক্ষা সম্পর্কে এই একটা প্রবল অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে বলতে হবে। অধিকন্তু পাঠ্যপুস্তকের বোর্ড এমন কতকগুলো নিয়ম করেছেন যার ফলে মর্যাদাসম্পন্ন লোকের পক্ষে পাঠ্যপুস্তক লেখা সম্মানহানিকর হয়ে পড়েছে।[৪২]

পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় পরীক্ষাপদ্ধতিও শিক্ষা ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। বস্তুত পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর মেধা, অধীত বিষয়সমূহে অর্জিত জ্ঞান প্রভৃতি যাচাইয়ের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃত মাধ্যম। অথচ আমাদের দেশে বিদ্যমান পরীক্ষাপদ্ধতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ক্রুটিমুক্ত নয়। কাজী মোতাহার হোসেনও মনে করেছেন প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে যোগ্যতার সম্যক যাচাই করা সম্ভব হয় না। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন :

> আজকাল ছেলেরা মুখস্থ না করে বই দেখে লিখছে। পরিদর্শকের কিছু করার নেই। এজন্য মৌখিক পরীক্ষা রয়েছে। তাতে কে দেখে লিখছে আর কে দেখে লেখেনি সেটা পরখ করা যায়। আমরা দেখেছি, লিখিত পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়েছে অথচ কিছুই বলতে পারে না।
>
> এ থেকে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। একটা হলো সে নকল করে পাশ করেছে। তাই ডিভিশন দেখে বিচার করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তথাকথিত প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্রের চেয়ে তথাকথিত তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্রটি গুণগতভাবে ভাল।[৪৩]

পরীক্ষায় নকল-প্রবণতা আমাদের সমাজে রীতিমত ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। নকলপ্রবণতার কারণে মেধা ও যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। কাজী মোতাহার তাই মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। মৌখিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নের অন্যতম পন্থা সন্দেহ নেই। সে হিসেবে তাঁর এই পরামর্শ বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু নকলমুক্ত পরীক্ষাগ্রহণ অর্থাৎ পরীক্ষা-কক্ষের পরিবেশ উন্নয়ন কিংবা পরীক্ষাপদ্ধতির কোন গুণগত পরিবর্তনের ব্যাপারে তাঁর সুবিজ্ঞ পরামর্শ পেলে সে-ক্ষেত্রে তা আরো সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হতো।

ছাত্রাবস্থায় জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার ওপর জাতীয় উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে দৈশিক ও জাতীয় ঐতিহ্যের পরিবর্তে বিজাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি মোহ লক্ষ করা যায়। মোতাহার হোসেন শিক্ষাক্ষেত্রে এ নীতি বা রীতিকে সমর্থন করেন নি। তিনি মনে করেছেন স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে দেশের এবং ব্যক্তির প্রকৃত সম্মান নিহিত। শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটানোর প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট :

> আমরা ঘরের খবর জানি না, জানবার প্রয়োজনও বোধ করি না, ...কিন্তু বৈদেশিক অর্থনীতি, তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন, দর্শন প্রভৃতি না জানলে দশের কাছে অর্থাৎ উপরওয়ালাদের কাছে মান থাকে না।...আমরা বিদেশীর সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্ক রাখব, কিন্তু তাই বলে নিজের দেশে নিজেরাই বিদেশী বনে যেতে রাজি নই। যে শিক্ষা আমাদের দেশের লোককে ঘৃণা করতে শেখায় বা তাদেরকে শোষণ করবার প্রবৃত্তি জোগায় সে দুষ্ট শিক্ষা থেকে আমাদের শতহস্ত দূরে থাকা দরকার; ...[৪৪]

জ্ঞান বিতরণে শিক্ষকের মেধা ও যোগ্যতা অতীব জরুরি বিষয়। কিন্তু ইংরেজ আমল থেকে অদ্যাবধি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে মেধাবী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের হার অতি নগণ্য। সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধার অভাব প্রভৃতি কারণে এ পেশায় মানুষ আকৃষ্ট হয় না। বিষয়টি কাজী মোতাহার হোসেনের দৃষ্টি এড়ায়নি। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকলে শিক্ষার মানোন্নয়নের সকল পরিকল্পনা ও আয়োজন বিফলে যাবে বলে তিনি অনুভব করেছেন। 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র পক্ষ থেকে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি মেধাসম্পন্ন শিক্ষকের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে তিনি বলেন :

> আজকাল যা পড়ানো হয় তাতে পরস্পরবিরোধী ধারণা জন্মে। এক সঙ্গে আমরা অনেক বিষয় শেখাতে যাই। যাতে ছাত্ররা খেই হারিয়ে ফেলে। উপরন্তু শিক্ষকদের মেধা অনুযায়ী ছাত্ররা ফল লাভ করে। আজকাল ছাত্রদের ভেতর ধারণা হয়েছে শিক্ষকদের বক্তব্যের বিরোধিতা করতে হবে। এই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষকতার ব্যাঘাত ঘটায়। এছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে অযোগ্য। যোগ্য ছাত্র ও শিক্ষক হলেই শিক্ষা হবে।[৪৫]

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এ ঘাটতি পূরণ, শিক্ষকতায় নিয়োজিত শিক্ষকদের যোগ্যতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কাজী মোতাহার পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁর ভাষায় :

> এই অভাব দূর করবার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া চাই এবং উপযুক্ত শিক্ষক আকৃষ্ট করার জন্য উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক সম্মানেরও নিশ্চয়তা থাকা দরকার। অবশ্য, ভাল ছাত্রেরাই ভাল শিক্ষক হ'তে পারে। তাই মনে হয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রশংসনীয়ভাবে যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে এদের রুচি ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে, দেশের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, আইনজ্ঞ, কৃষিবিদ, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি সৃষ্টি করবার জন্য সরকারী সাহায্যে এদের ভরণ–পোষণ ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।[৪৬]

মোতাহার হোসেন শিক্ষা-কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য যোগ্য শিক্ষকের পাশাপাশি যোগ্য ছাত্রের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে নানা কারণে অনেক অনুপযুক্ত ছাত্রকেও ভর্তি করা হয়, তারা ক্লাসের শিক্ষায় কিছুমাত্র উপকৃত হয় না। আর তারাই ক্লাসের বাইরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। যার থেকে বিভিন্ন রকম সমস্যার উদ্ভব হয়। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। এজন্য তিনি শিক্ষকদের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে ছাত্রদের প্রয়োজন ও গ্রহণের ক্ষমতার দিকে লক্ষ রেখে শিক্ষণীয় বিষয়কে সরল ও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন।[৪৭]

শিক্ষাঙ্গনে অধ্যয়নোপযোগী শান্তিপূর্ণ ও শান্তি পরিবেশ রক্ষার্থে ছাত্র-শিক্ষক সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অত্যাবশ্যক বলে কাজী মোতাহার মনে করেছেন। তিনি ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ককে অতিশয় ঘনিষ্ঠ বিবেচনা করেছেন। এবং সর্বদাই লক্ষ করেছেন 'ছাত্রদের ভালবাসলে তারাও শিক্ষকদের ভালবাসে'।[৪৮]

শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ জ্ঞানার্জনের পূর্বশর্ত হলেও আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে, কলুষিত হয়েছে জ্ঞান শিক্ষার পবিত্র পাদপীঠ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের দলীয় স্বার্থে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার এবং একশ্রেণীর শিক্ষকদের ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার প্রভৃতি এর প্রধান কারণ হিসেবে আলোচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন :

> এজন্যে তিন পক্ষ দায়ী। রাজনৈতিক দল, সরকার, ছাত্র-শিক্ষক সবাই দায়ী। রাজনৈতিক দলগুলো একদলকে ক্ষমতায় বসাচ্ছে, অন্যগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছে। এ প্রয়োজনে ছাত্রদের ঘুষ দিয়ে দলে টানা হচ্ছে। ... এদের জন্যেই ছাত্র ও শিক্ষকরা কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকদের মধ্যে অনেক দুশ্চরিত্র শিক্ষক রয়েছেন। আসলে দায়ী হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা।
>
> তারপরেও, চরিত্র ঠিক না হলে কিছুই হবে না। সরকারের চোখের সামনে চোরাকারবার হচ্ছে, কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। কেউই নির্দোষ নয়। একদিকে সরকার, আরদিকে বিরোধী দল। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে রেষারেষি। এ জন্যেই ছাত্রদের মধ্যে লাঠালাঠি, রক্তারক্তি। আজকে, দুনিয়া জোড়াই দূষিত পরিবেশ। শিক্ষা চরিত্র-নির্ভর। সকলের চরিত্র ঠিক হওয়া প্রয়োজন।[৪৯]

বস্তুত শিক্ষাকে তিনি আত্মিক, সামাজিক, পরমার্থিক উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মনে করেছেন। সে-কারণে তিনি শিক্ষক সমাজসহ গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি গণমুখী, সর্বজনীন, বিজ্ঞান-মনস্ক, বৈষম্যহীন, জনকল্যাণমূলক যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষানীতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।